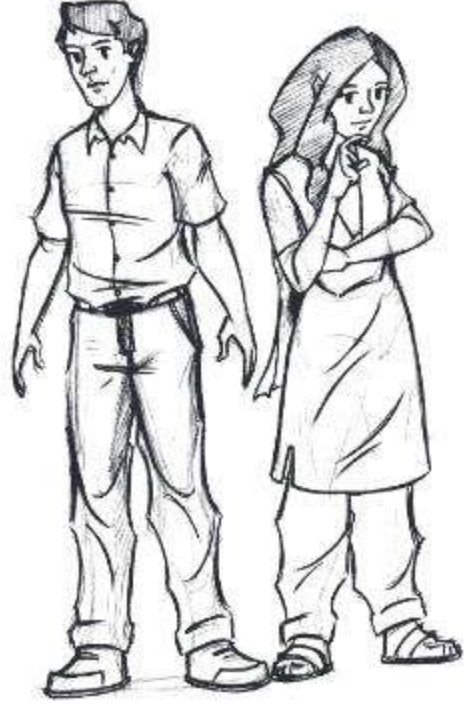


সপ্তম অধ্যায়

বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য

একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। শিশুটির বড় হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়কে কাল হিসেবে ধরা হয়। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর শৈশবকাল। শৈশবকালে ছেলে বা মেয়ে সকলকে শিশু বলা হয়। ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত বয়সকে আমরা বলি বাল্যকাল। বাল্যকালে শিশু মেয়ে হলে বালিকা এবং ছেলে হলে বালক বলা হয়। দশ থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে বা মেয়েকে কিশোর বা কিশোরী হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময়ে তাদের শরীর যথাক্রমে পুরুষের বা নারীর শরীরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বয়ঃসন্ধিকাল হচ্ছে বাল্যকাল ও যৌবনকালের মধ্যবর্তী সময়। একটি শিশু ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক, তার জন্ম থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব প্রতিটি স্তরেই তার সাধারণ স্বাস্থ্যের সাথে প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি জড়িত। তাই প্রজনন স্বাস্থ্য কী এবং এটা রক্ষা করার বিষয়ে সবারই জানা প্রয়োজন।



বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়ে

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- বয়ঃসন্ধিকাল ও বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সময় কী করণীয় তা নির্ধারণ করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে বিভিন্ন প্রকার মানসিক চাপ মোকাবিলার কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- প্রজনন স্বাস্থ্য ও তা সুরক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিধিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গর্ভকালীন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অটিজম ও থ্যালাসেমিয়া সম্বন্ধে ধারণা লাভ ও বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ-১ : বয়ঃসন্ধিকাল ও বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন : মানুষের জীবনে বয়সের ভিত্তিতে অনেকগুলো পর্যায় আসে। যেমন—শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়তা, বার্ধক্য। শিশুর জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শৈশবকাল, ছয় থেকে দশ বছর বাল্যকাল, দশ থেকে উনিশ বছর কৈশোরকাল বলা হয়। কৈশোরকালে একটি ছেলে বা মেয়েকে কিশোর বা কিশোরী বলা হয়। কৈশোরকালে কিশোর বা কিশোরীরা শারীরিকভাবে পুরুষ বা নারীতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই কৈশোরকালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল আগে শুরু হয়। মেয়েদের আট থেকে তেরো বছর বয়সের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়। ছেলেদের দশ থেকে পনেরো বছর বয়সে বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে এর আগে বা পরেও বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে দৈহিক বা শারীরিক পরিবর্তনগুলোই প্রথমে চোখে পড়ে। এই পরিবর্তন দেখলেই বোঝা যায় যে কারো বয়ঃসন্ধিকাল চলছে। বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো প্রধানত ৩ প্রকার।

১. শারীরিক ২. মানসিক ৩. আচরণিক

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন

কিশোরদের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে—

- ক. উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।
- খ. শরীরে দৃঢ়তা আসে, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়।
- গ. এ বয়সে দাড়ি-গোঁফ উঠে।
- ঘ. স্বরভঙ্গ হয় ও গলার স্বর মোটা হয়।
- ঙ. বীর্যপাত হয়।

কিশোরীদের পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ—

- ক. উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।
- খ. শরীর ভারী হয়, শরীরের বিভিন্ন হাড় মোটা ও দৃঢ় হয়।
- গ. ঋতুস্রাব শুরু হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে সবার ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তনগুলো একই সময়ে ও একই রকম নাও হতে পারে। যেমন—কিশোরীদের ক্ষেত্রে কারো আগে বা পরে ঋতুস্রাব শুরু হতে পারে। কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে সকলের উচ্চতা একইভাবে নাও বাড়তে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি নানা রকম মানসিক পরিবর্তনও হয়। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং সময়ের সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীরা এইসব পরিবর্তনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। বয়ঃসন্ধিকালে যেসব মানসিক পরিবর্তন সাধারণভাবে দেখা যায়—

- ক. অজানা বিষয়ে জানার কৌতুহল বাড়ে।
- খ. শারীরিক পরিবর্তনের ফলে চলাফেরায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লজ্জা কাজ করে।
- গ. স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা করে।
- ঘ. নিকটজনের মনোযোগ, যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হয়।
- ঙ. আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে।
- চ. ছেলে ও মেয়েদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।
- ছ. মানসিক পরিপক্বতার পর্ষায় শুরু হয়।

আচরণিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে আচরণগত পরিবর্তনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই—

- ক. প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করে।
- খ. বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নিজেকে একজন আলাদা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।
- গ. প্রত্যেক বিষয়ে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।
- ঘ. দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

কাজ-১ : শিক্ষকের নির্দেশ মতো ৫/৭ জনের দল গঠন কর। তোমার সহপাঠী/সমবয়সীদের কথা ভাব। প্রায় সবার ক্ষেত্রেই ঘটেছে এমন পরিবর্তনগুলো দিয়ে নিচের ছক দুইটি পূরণ করো। এর শিরোনাম দাও “সাধারণ পরিবর্তন”। এরপর অবশিষ্ট পরিবর্তনগুলো দিয়ে একটি তালিকা তৈরি করো। এর শিরোনাম হবে “অন্যান্য পরিবর্তন”। এটা হবে দলগত কাজ।

বয়ঃসন্ধিকালে সাধারণ পরিবর্তন	
শারীরিক পরিবর্তন	মানসিক পরিবর্তন
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

বয়ঃসন্ধিকালে অন্যান্য পরিবর্তন	
১.	
২.	
৩.	
৪.	

পাঠ-২ : বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপ ও পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো : আমরা পূর্বেই জেনেছি যে সাধারণত ছেলেমেয়েদের ১০-১৯ বছর বয়সের সময় কালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময়ে ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তবে আবহাওয়া, স্থান, খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও মানের তারতম্যের কারণে একেকজনের বয়ঃসন্ধিকালের শুরুর সময়ে কিছুটা তারতম্য হতে পারে। হরমোন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যার কারণে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো ঘটে। মেয়েদের শরীরে ও মনে বিভিন্ন পরিবর্তনে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন নামে দুটি হরমোন কাজ করে আর ছেলেদের যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ ঘটে তা টেস্টোস্টেরন নামক হরমোনের কারণে হয়।

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপ : ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের কারণে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। কারণ পরিবর্তনগুলো অনেকটা আকস্মিকভাবে শুরু হয়। এর সাথে পরিচিত না থাকার কারণে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং অপরাধবোধে ভোগে। এ সময় তাদের বুঝিয়ে বললে তারা আতঙ্কিত হবে না এবং তাদের মনে কোনো অপরাধবোধ কাজ করবে না। এ ধরনের অপরাধবোধ ও মানসিক দুশ্চিন্তা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ফলে ছেলেমেয়েদের মনে সর্বক্ষণ একটা অস্বস্তি কাজ করে। তারা মানসিক চাপের সম্মুখীন হয় এবং অনেক সময় পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে এবং এ সম্বন্ধে করণীয় বিষয়ে পূর্ব ধারণা থাকলে, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক প্রস্তুতি থাকে। ফলে তারা বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারে, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয় না এবং সম্ভাব্য রোগব্যাধিও প্রতিরোধ করা যায়। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন ঘটলে মা-বাবা, বড় ভাই-বোন বা নির্ভরযোগ্য অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে এ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যেতে পারে। ফলে সংকোচ কেটে যাবে এবং একা থাকার প্রবণতা কমে যাবে। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে আবেগিক পরিবর্তনও ঘটে। এ বয়সে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটে তার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সাথে মা বাবা ও অভিভাবকদের বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। তাদেরকে মানসিক দিকসহ অন্য সব ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান ও সাহস জোগাতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য তাদের নিজেদেরকেও সচেতন থাকতে হবে। তাদের প্রথম কাজ হবে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা। ভালো গল্পের বই পড়লে, সাথীদের সাথে খেলাধুলা করলে মনে প্রফুল্লতা আসবে এবং মানসিক চাপ সামলানো সম্ভব হবে।

কাজ-১ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে তালিকার মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক চাপ থেকে উত্তরণের কয়েকটি উপায় খাতায় লেখো।

পাঠ-৩ : বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা : বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য পুষ্টির খাদ্যের প্রয়োজন। সুস্থ দেহেই বাস করে সুন্দর মন। শরীর সুস্থ না থাকলে কোনো কিছুতেই আনন্দ পাওয়া যায় না। লেখাপড়া করতেও ইচ্ছে করে না। সেজন্য খাদ্য ও পুষ্টির দরকার। আবার যে কোনো খাবার খেলেই যে শরীর ভালো থাকবে তা নয়। কারণ সব ধরনের খাদ্যেই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে না। সেজন্য খাদ্য নির্বাচনের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন প্রতিদিনের খাবারে আমিষ, শর্করা, চর্বি বা তেল, খনিজ দ্রব্য, ভিটামিন ও পানি প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাওয়া যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও সুখম খাদ্য : বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের পুষ্টির প্রয়োজন খুব বেশি। কেননা এই সময়ে ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ বেড়ে উঠে এবং তাদের শারীরিক ত্রিমাত্রিক বৃদ্ধি পায়। সেজন্য তাদের প্রতিদিনই যথাযথ পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক ছেলে-মেয়ে ও তাদের অভিভাবকেরা এ বিষয়ে গুরুত্ব দেন না। কেউ কেউ মনে করেন যে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান ও পুষ্টি শুধু দামি খাবার ও ফলমূলেই পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। একটু সচেতন হলেই সহজপ্রাপ্য ও সুলভমূল্যের খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়।

বয়স, দৈহিক গঠন ও কাজের ধরনভেদে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা : ৬টি খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন বিভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমাহারকে সুখম খাদ্য বলে। বয়সভেদে এই “প্রয়োজনীয় পরিমাণের” তারতম্য হতে পারে। যেমন ১৩/১৪ বছর বয়সের কোনো কিশোর বা কিশোরীর পুষ্টির প্রয়োজন একটি ৮/৯ বছরের শিশুর চেয়ে বেশি। একই বয়সের মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীর পুষ্টির প্রয়োজনে কোনো তারতম্য নেই। আবার দু'জন একই বয়সের তরুণ বা তরুণী একজন বেশ দীর্ঘকায় ও স্বাস্থ্যবান এবং অপরজন ছোটখাটো ও সাধারণ স্বাস্থ্যের হলে, দৈহিক গঠনের কারণে প্রথমজনের প্রয়োজনীয় পুষ্টির তথ্য খাদ্যের পরিমাণ দ্বিতীয় জনের চেয়ে বেশি হবে। দু'জন একই বয়সি ও একই রকম দৈহিক গঠনের পুরুষের মধ্যে যিনি বেশি দৈহিক পরিশ্রম করেন তার খাদ্যের প্রয়োজন বেশি হতে পারে। দু'জন সমবয়সি এবং একই রকম দৈহিক গঠনসম্পন্ন মেয়ের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। এভাবে বয়স, দৈহিকগঠন ও কাজের ধরনভেদে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার তারতম্য হয়। কারণ খাদ্যের ৬টি উপাদানের প্রত্যেকটিই বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে-মেয়েদের দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য খুব প্রয়োজন। এগুলো দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায়। অন্যথায় যথাযথ পুষ্টির অভাবে দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ছেলেমেয়েরা নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়।



ছয়টি উপাদানসমৃদ্ধ খাবার

কাজ-১ : কিশোর-কিশোরীদের জন্য সকল খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ একটি দৈনিক সুখম খাদ্য তালিকা তৈরি কর। এই তালিকায় সহজে পাওয়া যায় এবং দাম কম এমন খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কাজ-২ : বয়স, শরীরের গঠন ও কাজের ধরন অনুযায়ী ছেলে-মেয়েদের ৬টি খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ এবং পুষ্টিকর খাবার না খেলে কী কী অসুবিধা হয় তা লিখে এনে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।

পাঠ-৪ : প্রজনন স্বাস্থ্য ও তা সুরক্ষার উপায় : প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়কে প্রজনন স্বাস্থ্য বলে। তাই প্রজনন বলতে সন্তান জন্মদানকে বোঝায়। পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ জন্ম ও সুস্বাস্থ্য বর্তমান প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য তথা সুস্থ প্রজনন তন্ত্রের উপর নির্ভর করে। তাই স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ ও আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেকের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় : হরমোনজনিত কারণে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকলে ছেলে ও মেয়েরা ভয় পেয়ে যায় এবং ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের ক্ষতি করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঋতুস্রাব ঘটলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও নিয়মিত গোসল করা দরকার। এ সময়ে পুষ্টিকর

খাবার ও প্রচুর পানি পান করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রাথমিক অবস্থায় মা-বাবা, নিকটাত্মীয় বা স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে। এ সময়ের মানসিক পরিবর্তনের বিষয়টি মনে রেখে ছেলে বা মেয়েদের সাথে বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। সহযোগিতামূলক আচরণ তাদের অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে, তাদের মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকবে এবং সুস্থভাবে বেড়ে উঠবে। প্রজনন স্বাস্থ্যের বড় ঝুঁকি হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হওয়া ও সন্তান ধারণ। এ কারণে রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়াও মা ও শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি থাকে। প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রাপ্তবয়সে বিয়ে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে সরকারি নির্দেশ মেনে চললে এই ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। নানা কারণে প্রজনন অঙ্গের রোগ দেখা দিতে পারে। প্রজনন অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে তা গোপন করা যাবে না। ডাক্তারের নির্দেশমতে ওষুধ ও পথ্য গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে সংক্রামক রোগ এবং যৌনরোগের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

কাজ-১ : প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যা করা প্রয়োজন সেগুলো নিচের ছকে লেখো।

করণীয় কাজ

- ১.
- ২.
- ৩.
- ৪.

পাঠ-৫ : প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি ও গর্ভকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যসেবা : মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে শুধু প্রজননতন্ত্রের কাজ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকে বোঝায় না। এটা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের একটি অবস্থা। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ জন্ম ও সুস্বাস্থ্য বর্তমান প্রজন্মের সার্বিক সুস্থতা প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে।

প্রজনন স্বাস্থ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

- ১। বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি : বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।
- ২। উপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণ : মেয়েদের ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ করা যাবে না। উপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণ করলে মা ও শিশু উভয়েই সুস্থ থাকে।
- ৩। নিরাপদ মাতৃত্ব : নিরাপদ মাতৃত্ব বলতে বোঝায় গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সময়ে মায়ের সুস্থতা বজায় রাখা। বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এর অন্যতম কারণ গর্ভকালীন সময়ে মায়ের যত্ন হয় না। তিনি পর্যাপ্ত খাদ্য, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা পান না। তাছাড়া অপরিশ্রুত বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণের ফলে মা ও শিশুর অসুস্থতাও ঘটে।

৪। শিশুর জন্য পূর্ব যত্ন : মায়ের গর্ভে সন্তান আসার পর পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য, চিকিৎসা, বিশ্রাম, ঘুম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হয়।

৫। নবজাতকের পরিচর্যা : জন্মের পর থেকে ২৮ দিন বয়স পর্যন্ত শিশুকে নবজাতক বলা হয়। জন্মের পর পরই শিশুকে শালদুধ খাওয়ানো, টিকা প্রদান প্রভৃতি পরিচর্যামূলক সেবা শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬। মা ও শিশুর পুষ্টি : আমাদের দেশে অধিকাংশ মা ও শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। গর্ভবতী মা ও প্রসূতি মা অপুষ্টিতে ভোগেন বলেই শিশু অপুষ্টির শিকার হয়। ঘনঘন গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব মা ও শিশুর অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ।

৭। প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের সেবা ও রোগ প্রতিরোধ : প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের মধ্যে রয়েছে সংক্রামক রোগ, যৌনরোগ, প্রজনন অঙ্গে ক্যান্সারসহ সব রকম রোগ। এসব রোগের সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনমতো সেবা গ্রহণ করতে হবে।

গর্ভকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যসেবা : গর্ভধারণ হচ্ছে শরীরের একটি বিশেষ পরিবর্তন। সন্তান গর্ভে এলেই শুধু মায়ের শরীরের এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরে কিছু কিছু অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায়। যেমন—ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, মাথা ঘোরা, বারবার প্রস্রাব হওয়া ইত্যাদি। পরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে শারীরিক ও মানসিক তেমন কোনো জটিলতা দেখা যায় না। গর্ভকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি ও সেবা হচ্ছে—

ক. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।

খ. নিয়মিত গোসল করা।

গ. পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ, বিশ্রাম ও ঘুম।

ঘ. গর্ভধারণের প্রথম থেকেই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা।

ঙ. গর্ভকালীন সমস্যা মোকাবিলায় জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখা।

চ. প্রজননতন্ত্রের যেকোনো সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

ছ. ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা। এছাড়া পড়াশোনারসহ বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক কাজে নিজেকে জড়িত রাখা ইত্যাদি।

কাজ-১ : একজন গর্ভবতী মায়ের যে যে বিষয়ে যত্ন নিতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

কাজ-২ : গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরের যেসব অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায় তা ধারাবাহিকভাবে লেখো।

পাঠ- ৬ : অটিজম (Autism)

দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করি। সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না আমাদের প্রতিদিনের ঘটনা। একটি পরিবারে যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন ঐ পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মা-বাবা শিশুটির সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য নানা ধরনের পরিকল্পনা করতে থাকে। তাদের এই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ। শিশুদের শারীরিক, মনো-সামাজিক, ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঘটলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যখন কোনো বাবা-মা বুঝতে পারে যে, তার শিশুটি অন্যান্য সাধারণ শিশুদের থেকে ভিন্ন আচরণ করছে অথবা বিকাশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করছে না বা বয়সের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে, তখন তাদের মাঝে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে পরিবারটিতে নেমে আসে হতাশা। সন্তানের এই ভিন্নতাকে মেনে নেওয়ার জন্য মা-বাবাকে প্রথমত সতর্কতা করতে হয় নিজের মনের সাথে। আবার সেই সাথে শিশুটির প্রতি সমাজের ও পরিবারের সদস্যদের বিরূপ/নেতিবাচক মনোভাবের কারণে মা-বাবাকে প্রতিনিয়তই অনেক বাধার সন্মুখীন হতে হয়।

জন্মের পর শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক (বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, হাতের সূক্ষ্ম কাজ), মানসিক (বুদ্ধি, আবেগ, স্মরণশক্তি, চিন্তা, আচরণ, ব্যক্তিত্ব), সামাজিক ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করাকেই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বলা হয়। আর বিকাশজনিত সমস্যা হলো এমন এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা যা শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের সময় ঘটে থাকে এবং শিশুর শরীরের যেকোনো অংশ অথবা সম্পূর্ণ শারীরিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুদের নানা ধরনের বিকাশজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, অটিজম সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি।

অটিজম কী?

অটিজম কোনো রোগ নয়। এটি স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যার একটি বিস্তৃত রূপ যা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার নামে পরিচিত। এখানে ‘স্নায়ু’ শব্দটি স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্কের সাথে স্নায়ুর সম্পর্ক বোঝায়। ‘বিকাশজনিত’ শব্দটির মাধ্যমে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

প্রাকশৈশব কাল থেকে এই সমস্যাটি শুরু হয়, যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সাধারণত শিশুর জন্মের দেড় বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। সামাজিক সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং আচরণের ভিন্নতাই এই সমস্যাটির প্রধান বিষয়। এছাড়াও অটিজম রয়েছে এমন শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিভিত্তিক, শিক্ষণ প্রক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সংক্রান্ত সমস্যাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এটা মনে রাখা জরুরি যে, সব অটিস্টিক শিশুই এক রকম নয়। যেমন- অটিজমের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সব অটিস্টিক শিশুর মধ্যে কম-বেশি পরিলক্ষিত হয় আবার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে।

অটিজম আছে এমন শিশুদের সাধারণ কিছু আচরণ

- চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা
- ডাকলে সাড়া না দেওয়া
- বিকাশজনিত দক্ষতার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা
- প্রাথমিক রুটিন পরিবর্তনে বাধা দান
- অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উদ্বেজনা
- আবেগ প্রকাশে অসুবিধা
- অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি
- সত্যিকার বিপদে ভয় না পাওয়া, অন্যদিকে তেমন বিপজ্জনক নয় এমন অবস্থা বা পরিবেশে অস্বাভাবিক ভয় পাওয়া
- অসংগতিপূর্ণ হাসি-কান্না
- কোনো কিছুর প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ
- খাওয়া, ঘুম, মলমূত্র ত্যাগে অস্বাভাবিকতা
- নিজের বা অপরের জন্য বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবহার
- অখাদ্য খাওয়া

অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

অটিজমের বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে আলাদা। মূল শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো—সামাজিক মেলামেশা, যোগাযোগ ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই অটিজমের মূল লক্ষণ হিসেবে পরিচিত। অটিজমের কারণে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অপরের সাথে যোগাযোগ করার কৌশল এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে তাদের মধ্যে একই ধরনের আচরণ অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের উৎসাহ দেখা যায়। এটা জানা জরুরি যে, অটিজমের লক্ষণগুলো স্নায়বিক কারণে হয় এবং একজনের সাথে আরেকজনের হুবহু মিল নেই।

ক. সামাজিক লক্ষণসমূহ

অটিজম আছে এমন শিশুদের অধিকাংশের মধ্যেই অন্যের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় গুরুতর সমস্যা দেখা যায়। জীবনের প্রথম কয়েক মাস তারা অন্যের চোখে চোখ রেখে তাকায় না। তারা অন্যের প্রতি নির্লিপ্ত থাকে এবং একা থাকতে পছন্দ করে। তারা অন্যের মনোযোগ পেতে চায় না এবং জড়িয়ে ধরা পছন্দ করে না। তারা অন্যের রাগ বা আদরের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

অটিস্টিক শিশুদের কোনো কিছু শিখতে অনেক সময় লাগে এবং তারা অন্যের চিন্তা ও অনুভূতি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখায় না। সাধারণ ইশারা-ইঙ্গিত যেমন—মুচকি হাসি, চোখ পিট পিট করা বা মৌখিক অভিব্যক্তি তাদের কাছে কম অর্থপূর্ণ বিষয়। এইসব শিশু যারা ইশারা বুঝতে পারে না তাদের কাছে ‘এদিকে এসো’ বাক্যটি সবসময় একই অর্থ বহন করে। অথচ এই বাক্যটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। দেহভঙ্গি ও মৌখিক অভিব্যক্তি না বোঝার কারণে এসব শিশুর কাছে তার সামাজিক জগৎ বোধহীন হয়ে উঠে।

অটিস্টিক শিশুদের উদ্বেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠার প্রবণতা তাদের সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যখন তারা অপরিচিত ও বাইরের পরিবেশে যায় তখন তারা রেগে যায় বা হতাশ হয়, আবার তাদের কেউ কেউ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ সময় তারা জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে পারে, অন্যকে আঘাত করতে পারে অথবা নিজের শরীরেও আঘাত করতে পারে।

খ. যোগাযোগের সমস্যা

যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষাগত অসুবিধার কারণে অটিস্টিক শিশুদের অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা দেখা দেয়। ভাষাগত বিকাশের ক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কিছু অটিস্টিক শিশু কখনোই কথা বলতে শেখে না, তারা সারা জীবন নিশুপ থেকে যায়। কোনো কোনো শিশু জন্মের কয়েক মাস পরে বাবলিং বা আধো আধো কথা বলতে শেখে কিন্তু কিছুদিন পর সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। আবার কারো ক্ষেত্রে ভাষা শিখতে ৫ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তবে অটিস্টিক শিশুরা ছবি, ইশারা ভাষা বা স্পর্শের সাহায্যে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা শিখতে পারে। অটিজম আছে এমন অনেক শিশুর ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। তারা শব্দ বিন্যাস করে সঠিক বাক্য গঠন করতে পারে না, কেউ কেউ একটি শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে, কেউ কেউ যে শব্দটি শোনে সেটিই বারবার বলতে থাকে। কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু কোনো একটি নির্দিষ্ট শব্দ বলে এবং টিয়াপাখির মতো শব্দটি বারবার এক নাগাড়ে বলতে থাকে, যাকে ইকোলোজিয়া বলে।

অনেক অটিস্টিক শিশু রয়েছে যাদের ভাষার ক্ষেত্রে খুব সামান্য সমস্যা থাকে। এরা অনেক শব্দ ব্যবহার করে ভালোভাবে কথা বলতে পারে তবে সঠিকভাবে কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারে না। তারা বাক্যের অর্থের তারতম্য বুঝতে পারেনা। আরেকটি বিষয় হলো শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, কণ্ঠস্বর উঠানামার ফলে কথার অর্থের যে ধরনের তারতম্য হয় তা তারা সঠিকভাবে বুঝে না।

গ. পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ

অটিজম আছে এমন শিশুরা শারীরিকভাবে স্বাভাবিক এবং প্রায় সবারই পেশি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ভালো, কিন্তু অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ তাদেরকে অন্য শিশুদের থেকে আলাদা করে রাখে। এই অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ তীব্র থেকে মৃদু হতে পারে। তাদের অনেকেই বারবার হাত নাড়ায়, পায়ের সামনের অংশের উপর ভর দিয়ে হাঁটে, অথবা কোনো একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দীর্ঘসময় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা অনেক সময় খেলনা গাড়ি বা ট্রেন দিয়ে খেলা করার বদলে এগুলোকে এক লাইনে সাজায়। যদি অসাবধানতাবশত কেউ তাদের এই সাজানো গাড়ি বা ট্রেন নাড়িয়ে ফেলে তবে তারা খুব হতাশ বা বিচণ্ডিত হয়ে পড়ে।

অটিস্টিক শিশুরা চায় তাদের চারপাশের সবকিছু যেমন আছে তেমনই থাকুক। তারা কোনো পরিবর্তন পছন্দ করে না। তাদের দৈনন্দিন রুটিনের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী খাওয়া, গোসল করা, একই রাস্তায় নির্দিষ্ট সময়ে জুলে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সামান্যতম হেরফের হলে তারা খুব বিরক্ত হয়। পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ তাদের আচরণকে আগে থেকেই যুক্ত করে রাখে, যেমন—অটিস্টিক শিশু ফ্যান ঘোরা ও আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘ সময় পার করে দেয় ইত্যাদি। তাদের কারো কারো মধ্যে সংখ্যা, চিহ্ন বা বিজ্ঞান বিষয়ে দারুণ আগ্রহ দেখা যায়।

অটিজমের সাথে সম্পর্কিত কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলি ও সবল দিক

অটিস্টিক শিশুদের কোনো বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা বা ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। এর সংখ্যা অতি নগণ্য তবুও এ ধরনের বিশেষ দক্ষতা তাদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং তাদেরকে করে তুলতে পারে অসাধারণ। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, প্রতিটি অটিস্টিক শিশুর মধ্যে এ ধরনের বিশেষ প্রতিভা থাকবে। তবে এ বিষয়ে সচেতন থাকলে তাদের সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করা সহজ হবে, শিশুটি সমাজে সমাদৃত হবে এবং তার অন্যান্য দিকের ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ হবে।

অটিস্টিক শিশুরা যে বিষয়টির উপর বেশি মনোযোগ দেয় সে দিকেই তাদের প্রতিভা বিকশিত হতে পারে। দেখা যায় ক্যালেভারের দিকে মনোযোগ আছে এমন শিশুটি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মতারিখ বা বার সঠিকভাবে মনে রাখতে পারে, এভাবে সে একসাথে অনেক তথ্য মনে রাখতে পারে। আবার একটি কঠিন ও কৌশলী কাজকে ছোট ছোট সহজভাগে ভাগ করে এবং সেটার দিকে মনোযোগ দিয়ে তারা সেই কঠিন ও কৌশলী কাজটি সমাধা করতে পারে।

অটিজম আছে এমন শিশুদের কিছু সবল দিক

- সুনিপুণভাবে দেখার ক্ষমতা
- সুজ্ঞান নিয়মনিতির ধারণা, সিকোয়েন্স (ধারাবাহিকতা), প্যাটার্ন ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে ও মনে রাখতে পারে
- বিস্তারিত ও মুখস্থ করার মতো বিষয় (গণিত, ট্রেনের সময়সূচি, খেলার স্কোর) মনে রাখতে পারে
- দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা
- সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ
- বিশেষ পছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ
- শৈল্পিক দক্ষতা
- অল্প বয়সে লিখিত ভাষা পড়তে পারা (বুঝতে পারুক বা না পারুক)
- বানান মনে রাখা
- সততা
- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা

তোমাদের শৈশবিক অটিস্টিক বন্ধুদের তোমরা কীভাবে সহায়তা প্রদান করতে পার

অটিস্টিক শিশুদের সহপাঠীদের ‘সহযোগী বন্ধু’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সহপাঠীদের মধ্যে বন্ধুত্বের ধারণা এবং লক্ষ্য অর্জনে একতাবদ্ধতার পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে অটিস্টিক শিশুরা যথাযথ সহায়তা, সম্মান নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সংবেদনশীলতা ও ইতিবাচক মানসিকতায় প্রায় সবাই আমরা উপকৃত হব কেননা এদের মধ্যে কেউ আমাদের ভাই, বোন, প্রতিবেশী বা আত্মীয়। অটিজম-সংক্রান্ত শিক্ষা বা সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর উপর ভিত্তি করে হবে না, তা সার্বিকভাবে হতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনা বুঝতে ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বাড়াতে সহপাঠীদের করণীয়

১. এক শ্রেণিকক্ষ থেকে অন্য শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যাওয়া।
২. শ্রেণিকক্ষের কাজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণ গুছিয়ে রাখা।
৩. শ্রেণিকক্ষের জন্য নির্ধারিত রুটিন মেনে চলা।
৪. সহপাঠীদের সাথে মেলামেশার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।
৫. শ্রেণিশিক্ষকের পড়ানোর বিষয়টির সারমর্ম বলা এবং মূল বিষয়টি পুনরায় বলা।
৬. শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
৭. মৌখিকভাবে অথবা যোগাযোগ সহায়ক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত উত্তরসমূহ লিখিতভাবে প্রকাশে সাহায্য করা।
৮. হতাশ হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করা।
৯. অন্যের সাথে যোগাযোগ ছাপন করার জন্য সর্বদা তাকে পুরস্কৃত করা।
১০. শ্রেণিকক্ষের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

সাধারণত সারাজীবন ধরে অটিজমের লক্ষণগুলো একজনের মধ্যে থাকতে পারে, তবে যথাযথ সাহায্য, নির্দেশনা ও উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সময়ের সঙ্গে কিছু কিছু লক্ষণের উন্নতি হয়। যাদের মাঝে অল্প মাত্রার সমস্যা থাকে তাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় এবং তারা মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন বাপন করতে পারে। মাঝারি ও বেশি সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, এবং নিজের যত্নও নিতে পারে না। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা পেলে অটিস্টিক শিশুরা নানাক্ষেত্রে সফলতা পেতে পারে।

কাজ-১: অটিজমের লক্ষণগুলো লেখো।

কাজ-২: শ্রেণিকক্ষে অটিস্টিক শিশুদের সাথে সহপাঠীদের কী করণীয় তা বোর্ডে লেখো।

পাঠ-৭ : থ্যালাসেমিয়া

থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রক্তরোগ। থ্যালাসেমিয়া হলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অনেক কমে যায়। শিশুর জন্মের পর কয়েক মাস বা বছরের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন-ক্লান্তি, অবসাদ, শ্বাসকষ্ট, ফ্যাকাশে ত্বক ইত্যাদি। অধিক হারে লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে যাওয়ার ফলে জন্ডিস হতে পারে, প্লীহা এবং যকৃৎও বড় হয়ে যেতে পারে। রোগটির জটিলতা দিন দিন বাড়তে থাকে, শারীরিক বৃদ্ধি প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম থ্যালাসেমিয়াপ্রবণ দেশ। শতকরা ১০-১২ ভাগ মানুষ এই রোগের বাহক; অর্থাৎ প্রায় দেড় থেকে দুই কোটি মানুষ তাদের অজান্তে এই রোগের বাহক। দুজন থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে সন্তানের এই রোগটি দেখা দিতে পারে। বাহকরা সাধারণত সুস্থ, তাদের তেমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এ কারণে অনেকেই বুঝতে পারে না তিনি থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক।

থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। চিকিৎসার জন্য প্রতি মাসে অনেক টাকা খরচ হয়। সন্তানের চিকিৎসা করাতে রোগীসহ পুরো পরিবার মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৯৭ ভাগ পিতামাতা সন্তানের থ্যালাসেমিয়ার শনাক্ত হওয়ার আগে এই রোগের নাম-ই শোনেননি।

এই রোগীকে নিয়মিত রক্ত দিতে হয়। প্রতিনিয়ত রক্ত জোগার করার অনিশ্চয়তা নিয়ে রোগীরা সবসময় বিচলিত থাকে। লৌহযুক্ত খাবার বা আয়রন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করলে এ রোগে তেমন উপকার পাওয়া যায় না, বরং জটিলতা বাড়ে। নিয়মিত রক্ত পরিসংখ্যান ও অন্যান্য চিকিৎসা করা হলেও অনেক রোগী অল্প বয়সে মারা যায়।

থ্যালাসেমিয়া রোগটি অনিরাময়যোগ্য হলেও এটি শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য। জীবনে একটি মাত্র টেস্ট (হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস) করে নিশ্চিত হওয়া যায় কেউ থ্যালাসেমিয়ার রোগের বাহক কি না। দুইজন থ্যালাসেমিয়া বাহক নারী-পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাদের সন্তানেরও থ্যালাসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ফলে দুই বাহকের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। দুজনের মধ্যে যদি একজন বাহক ও আরেকজন স্বাভাবিক হন তবু তাঁদের সন্তানের বাহক হিসেবে জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় (যেমন: কাজিন)দের মধ্যে বিবাহ হলে থ্যালাসেমিয়া ও এ জাতীয় জিনগত রোগাত্মক সন্তান জন্মানের ঝুঁকি বেড়ে যায়। উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলে থ্যালাসেমিয়ার মতো বংশগত রোগ নিয়ে আলোচনা করতে অভিবাবকদের মধ্যে অনীহা

কাজ : থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের উপায় লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চাল কোন জাতীয় খাবার?

ক. আমিষ

খ. শর্করা

গ. স্নেহ

ঘ. খনিজ

২. মা ও শিশুর অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ কোনটি?

ক. বাল্যবিবাহ

খ. অজ্ঞতা

গ. ঘন ঘন মা হওয়া

ঘ. চিকিৎসার অভাব

৩. প্রজনন কী?

ক. গর্ভকালীন বোধ

খ. গর্ভপাত

গ. নবজাতকের পরিচর্যা

ঘ. সন্তান জন্মদান

৪. বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের কারণ—

i. পুষ্টির তারতম্য

ii. হরমোন

iii. প্রজনন স্বাস্থ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৫. হরমোনজনিত কারণে কিশোরদের শারীরিক কী পরিবর্তন ঘটে?

ক. শরীর ভারী হয়

খ. হাড় মোটা হয়

গ. বুক ও কাঁধ চওড়া হয়

ঘ. উচ্চতা বাড়ে ও ওজন কমে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শফিক সাহেব একজন কৃষক। তার মেয়ে নাকিমা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। অভাবের কারণে তাকে পড়ালেখা করাতে হিমশিম খাচ্ছে। এমন অবস্থায় সে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেন। বছর খানেক পরে তার গর্ভে সন্তান আসে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নাকিমা অসুস্থ থাকে। নাকিমার এই অবস্থা দেখে পাশের বাড়ির স্কুল শিক্ষক বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এলাকার কিছু তরুণ উদ্যোগী হয়ে কর্মসূচিটি সফল করতে কাজ শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে দেখা গেল ৩ বছরের মধ্যে গ্রামে কোনো বাল্যবিবাহ হয় নাই।

৬. নাকিমার এ অবস্থার কারণ কী?

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ক. অপরিশ্রুত বয়সে গর্ভধারণ | খ. পুষ্টিহীনতা |
| গ. অজ্ঞতা ও অসচেতনতা | ঘ. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা |

৭. নাকিমাদের মতো মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধকল্পে প্রধান করণীয় কোনটি?

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ক. পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তকরণ | খ. ব্যাপক প্রসারমূলক কার্যক্রম |
| গ. মা ও বাবাকে আইন সম্পর্কে জানানো | ঘ. বিয়ের বয়স কমিয়ে দেওয়া |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

শীলা ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। বিষণ্ণতার কারণে সে সারাদিন নিজের ঘরে একা থাকে। কোনো কাজে আনন্দ পায় না এবং লেখাপড়ায় অনীহা প্রকাশ করে। ডাক্তারের কাছে নিলে তিনি বলেন, এটা তার রোগ নয়, এ সময়ের সমস্যা।

৮. শীলার এ সময়কালকে কী বলে?

- | | |
|-----------------|------------|
| ক. বাল্যকাল | খ. যৌবনকাল |
| গ. বয়ঃসন্ধিকাল | ঘ. শিশুকাল |

৯. উদ্দীপকে শীলার প্রতি তার বাবা-মায়ের করণীয়—

- কঠোর শাসন
- সহানুভূতিশীল ব্যবহার
- বন্ধুত্বসুলভ আচরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফ সাহেবের মেয়ে টুসুর জন্মের কয়েক বছর পর দেখলেন যে, স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে তার আচরণ ভিন্ন এবং বয়সের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। তাকে ডাকলে সাড়া দেয়না, একই কথা বার বার বলে। সে নিজে যা বুঝে তাই করে। সে সকলের সাথে মিলেমিশে চলতে পারে না।

ক. অটিজম কী?

খ. অটিজম কেন হয়? ব্যাখ্যা করো।

গ. টুসু কী ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. টুসুর আচরণ সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।